ধর্মের নবযুগ

রবীন্দ্রনাথের জন্মের নব্বই বছর আগে রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন রামমোহন রায়ের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন রামমোহনের বিশেষ স্নেহের পাত্র।

রামমোহন রায়ের নিজের জীবনে, আর তাঁর যুগে, পূর্ব ও পশ্চিমে ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত ও শুরু হল আমাদের দেশে। স্যার উইলিয়ম জোন্‌স-এর চেষ্টায় পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের কাছে নতুন করে প্রাচ্য সাহিত্যের আবিষ্কার হলো। আর অন্য দিকে ইংরাজি সাহিত্য ও পাশ্চাত্ত্য যুগসন্ধির সঙ্গে পরিচয়ের উত্তেজনা বাংলাদেশে প্রবল হয়ে উঠলো। এই যুগসন্ধির সময় রবীন্দ্রনাথের জন্ম। রামমোহন রায়, হিন্দু, ইসলাম, খৃষ্টান ধর্মের মত, বিশ্বাস, শাস্ত্র আর ইতিহাস খুঁটিয়ে আলোচনা করলেন। তাঁর মনে কোনো সন্দেহ রইল না যে, নানা বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে গভীর ঐক্য আছে, যার মূল ভিত্তি হচ্ছে একেশ্বরবাদ। এই বিশ্বাসের উপরে নির্ভর করে রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের কাজ আরম্ভ করলেন।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল পর্যন্ত মোটামুটি রামমোহন রায়ের আদর্শ ও প্রভাব বাংলা দেশে ভিতরে ভিতরে কাজ করেছে। রবীন্দ্রনাথ নানা জায়গায়, নানা ভাবে, বারে বারে বলেছেন যে তিনি রামমোহনের অনুবর্তী। রামমোহনের মৃত্যু-শতবার্ষিকীতে ১৯৩৩ সালে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

"মানব ইতিহাসের প্রধান সমস্যাটা কোথায় যেখানে কোনো অন্ধতায়, কোনো মূঢ়তায়, মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ ঘটায়। মানব সমাজের সর্বপ্রধান তত্ত্ব মানুষের ঐক্য। সভ্যতার অর্থই—হচ্ছে, মানুষের এক হবার অনুশীলনা।"

"রামমোহন রায় উদার প্রশস্ত পন্থায় সকলকেই আহ্বান করেছেন। যে পন্থায়, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই অবিরোধে মিলিতে পারে। মানুষের ঐক্যের বার্তা রামমোহন রায় একদিন ভারতের বাণীতেই ঘোষণা করেছিলেন, এবং তাঁর দেশবাসী তাঁকে তিরস্কৃত করেছিল। তিনি সকল প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমন্ত্রণ করেছিলেন মুসলমানকে, খৃষ্টানকে, ভারতের সর্বজনকে, হিন্দুর এক পংক্তিতে, মহা-অতিথিশালায়।"

রবীন্দ্রনাথ নিজেও বারে, বারে, নানা বিচিত্র সভ্যতার ধারা, নানা বিচিত্র সংস্কৃতির মিলনের কথা বলেছেন। এই ভাবটি প্রকাশ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় একটা নতুন কথা ব্যবহার করলেন বিশ্বমানব। তাঁর কাছে এই বিশ্বমানবের আদর্শ কোনো অবাস্তব, আকাশ-কুসুমের মতো জিনিস ছিল না। একে ধরাছোঁয়া যায়। বিশ্বমানব হচ্ছে, মানুষের সব রকম আদর্শের আধার। তার প্রকাশ হবে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতায়, মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক সম্বন্ধের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। এক দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির গভীর ঐক্যের মধ্যে। নানা ভাষা, নানা সভ্যতা, নানা সংস্কৃতির সঙ্গে বিশ্বমানবের প্রকাশ। এক একজন মানুষের জীবনকাল, এক এক সভ্যতা, এক এক সংস্কৃতির অভ্যুদয়, ইতিহাসের উত্থান ও পতন অতিক্রম করে, বিশ্বমানবের শাশ্বতরূপ।

এই বিশ্বমানব কথাটি ব্যবহার করার অনেক আগে থেকে, রবীন্দ্রনাথের লেখায়, এই বিশ্বমানব ভাবটির পূর্বাভাস পাওয়া যায়। যেমন, প্রত্যেকটি ভাষার বৈশিষ্ট্য ও তাহার মূল্য সম্বন্ধে তিনি বারে বারে আলোচনা করেছিলেন। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে বাংলা ভাষারও স্থান আছে, প্রয়োজন আছে, এ কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর তেইশ বছর বয়সে।

পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ শুনিতে পেয়েছি ওই
সবাই এসেছে লইয়া নিশান কৈরে বাঙালী কই—
উঠ বঙ্গ কবি মায়ের ভাষায়
মুমূর্ষেরে দাও প্রাণ
বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাহি বলে
কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি, গান গেয়ে কবি
জগতের তলে স্থান কিনে দাও তুমি।

তিরিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথই প্রথম আন্দোলন আরম্ভ করলেন যে, বাংলা ভাষার মাধ্যমে বাঙালীর শিক্ষা দেওয়া চাই, শিক্ষা দেওয়া হোক। এই নিয়ে অনেক বিরুদ্ধতা বিদ্রূপ তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল।
রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :—

বিশ বাইশ বছর ধরিয়া আমরা যে সকল ভাব শিক্ষা করি আমাদের জীবনের সহিত তাহার একটা রাসায়নিক মিশ্রণ হয় না বলিয়া

আমাদের মনের ভারি একটা অদ্ভুত চেহারা বাহির হয়। শিক্ষিত ভাবগুলির কতক আঠা দিয়ে জোড়া থাকে আর কতক কালক্রমে ঝরিয়া পড়ে। একই লোক একদিকে ইউরোপীয় দর্শন, বিজ্ঞান এবং ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অন্যদিকে চিরন্তন কুসংস্কারগুলি সযত্নে পোষণ করিতেছেন। একদিকে স্বাধীনতার উজ্জ্বল আদর্শ মুখে প্রচার করিতেছেন, অন্যদিকে অধীনতার শত সহস্র নীতিতন্ত্রের পাশে আপনাকে এবং অন্যকে প্রতি মুহূর্তে আচ্ছন্ন দুর্বল করিয়া ফেলিতেছেন। শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয়। এই মিলনকে সাধন করতে পারে বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য।"

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :—

যথার্থ সাহিত্য যেমন জাতীয় ঐক্যের ফল তেমনই জাতীয় ঐক্যসাধনে প্রধানতম উপায় সাহিত্য। পরস্পর পরস্পরকে পরিপুষ্ট করিয়া তোলে। যাহা অনুভব করিতেছি তাহা প্রকাশ করিতে পারিব। যাহা শিক্ষা করিতেছি তাহা রক্ষা করিতে পারিব। যাহা লাভ করিতেছি, তাহা বিতরণ করিতে পারিব। এমন একটা ক্ষমতার অভ্যুদয় হইলে তাহা সমস্ত জাতির উল্লাসের কারণ হয়। তাহারই অপেক্ষা করিয়া আমরা পথ চাহিয়া আছি।"

সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই হল ভিতরকার কথা। ওই কথাটা কিছুদিন পরে আরো পরিষ্কার করে আলোচনা করেছেন।

"মনে আছে আমারই কোনো এক প্রবন্ধ লইয়া আলোচনা উঠিয়াছিল, যে বাংলা ভাষাকে যতদূর সম্ভব সংস্কৃতের মতো করিয়া তোলা উচিত। কারণ তাহা হইলে গুজরাটি, মারাঠি সকলের পক্ষেই বাংলা ভাষা সুগম হইবে। অবশ্য এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বাংলা ভাষার যে একটি নিজস্ব আছে অন্য দেশবাসীর পক্ষে বাংলা ভাষা বুঝিবার সেইটাই প্রধান বাধা। অথচ বাংলা ভাষায় যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু সৌন্দর্য, সমস্তই তাহার সেই নিজস্ব লইয়া। অতএব বাঙালী বাংলা ভাষার বিশেষত্ব অবলম্বন করিয়া সাহিত্যের যদি উন্নতি করে, তবেই হিন্দীভাষীদের সঙ্গে তাহার বড় রকমের মিল হইবে। সে যদি হিন্দীভাষীদের সঙ্গে সস্তায় ভাব করিয়া লইবার জন্য, হিন্দীর ছাঁদে বাংলা লিখিতে থাকে, তবে বাংলা সাহিত্য অধঃপাতে যাইবে, এবং কোনো হিন্দুস্থানী তাহার দিকে দৃকপাতও করিবে না। সকল প্রকার ভেদকে ঢেঁকিতে কুটিয়া একটা

পিণ্ডাকার পদার্থ গড়িয়া তোলাই জাতীয় উন্নতির চরম পরিণাম, তখনকার দিনে ইহাই সকলকার মনে জাগিতেছিল। কিন্তু আসল কথা, বিশেষত্ব বিসর্জন করিয়া যে সুবিধা, তাহা দুদিনের ফাঁকি। বিশেষত্বকে মহতে লইয়া গিয়া যে সুবিধা তাহাই সত্য।"

সাইত্রিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করেন। এই সময়ের লেখার মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সংঘাত যে বিশ্বমানবের আদর্শকে আঘাত করে, বাধা দেয়, এই ভাবটি পরিচয় পাই।

"স্বার্থের প্রকৃতি বিরোধ। ইউরোপীয় সভ্যতার সীমায় সীমায় সেই বিরোধ উত্তরোত্তর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে।...ইউরোপের এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতা ধর্মকে প্রকাশ্যভাবে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। জোর যার মুল্লুক তার এই নীতি স্বীকার করিতে অপমান বোধ করিতেছি না।"

উনবিংশ শতাব্দী যেদিন শেষ হলো, রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :—

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে অস্ত গেল
হিংসার উৎসবে আজি বাজে অস্ত্রেঅস্ত্রে
মরণের উন্মাদ রাগিণী ভয়ঙ্করী।
দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী তুলেছে কুটিল ফণা
চক্ষের নিমেষে গুপ্ত বিষদন্ত তার ভারি তীব্র বিষে।
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে ঘটেছে সংগ্রাম
প্রলয় মন্থন ক্ষোভে ভদ্রবেশী বর্বরতা
উঠিয়াছে জাগি পঙ্ক শয্যা হতে"

লিখেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিনে। সত্তর বছর হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আজকের দৃশ্যই যেন সেদিন দেখেছিলেন :—

"শতাব্দীর সূর্য আজি অস্ত গেল রক্তমেঘ মাঝে"

রবীন্দ্রনাথের মনে বিশ্বমানবের আদর্শ ক্রমে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তিনি বললেন :—

"জগত জুড়িয়া সমস্যা এই নহে যে, কি করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইব, কিন্তু কি করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়া মিলন হইবে। সে কথাটা কঠিন, কারণ সেখানে কোনো প্রকার ফাঁকি চলে না। সেখানে পরস্পরকে পরস্পরের জায়গা ছাড়িয়া দিতে হয়। সেটা সহজ নয়। কিন্তু যেটা

সহজ সেটা সাধ্য নয়। পরিণামের দিকে চাহিলে দেখা যায়, যেটা কঠিন সেটাই সহজ।"

রবীন্দ্রনাথের কাছে মানব সভ্যতার উদ্দেশ্য হচ্ছে :—

"নানা পথকে একই লক্ষ্যে অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা। বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে পরিষ্কার করা।"

আবার ফিরে আসি, বিশ্বমানবের আদর্শে, যা প্রকাশ পায়, বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনে। সাহিত্যকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মিলনের সেতু।

আজ বলবার দিন এসেছে, যে বাংলা সাহিত্য হোক মিলনের সেতু, সমস্ত বাংলা দেশের। রাজনীতির দিক দিয়ে নয়। সংস্কৃতির দিক দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ একদিন লিখেছিলেন :—

"…তোমায় আমায় দেখা শত শত বার
একদিন জনহীন তমাল পুলিনে
গোধূলির শুভলগ্নে হেমন্তের দিনে
সাক্ষী করি পশ্চিমের সূর্য অস্তমান
তোমারে সপিয়াছিনু আমার পরাণ
হে পদ্মা আমার ॥"

সেই পদ্মা আজও চলেছে, যদিও পশ্চিমবঙ্গে নয়, সে চলেছে, বাংলা সাহিত্যের ভিতর দিয়ে। আজ সেই মিলনের আদর্শ সার্থক হোক রবীন্দ্রনাথের —যে রবীন্দ্রনাথ সংস্কারের দ্বারা আবদ্ধ নয়, যে রবীন্দ্রনাথ কোনো গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, যে রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা :—

"বাঙালীর পণ, বাঙালার আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা—
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান ॥"
"বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন—
এক হউক, এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান ॥"

রবীন্দ্রনাথ আরেকটি বিষয় অত্যন্ত গভীরভাবে আলোচনা করেছেন। বারে বারে বলেছেন, বর্তমান যুগ হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ।

"বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নিয়মের কোথাও একটু ত্রুটি থাকতে পারে না এই বিশ্বাসটাই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জোরেই জিত হয়। পশ্চিমের লোকে এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে ভর করে নিয়মকে চেপে ধরেছে, আর তারা বাইরের জগতের সকল সঙ্কট তরে যাচ্ছে। এখনো যারা বিশ্ব ব্যাপারে জাদুকে অস্বীকার করতে ভয় পায়, এবং দায়ে ঠেকলে জাদুর শরণাপন্ন হবার জন্য যাদের মন ঝোঁকে, বাইবের বিশ্বে তারা সকলদিকেই মার খেয়ে মরছে, তারা আর কর্তৃত্ব পেলো না।

* * *

পশ্চিম দেশে পলিটিক্যাল স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ বিকাশ হতে আরম্ভ হয়েছে কখন থেকে? অর্থাৎ কখন থেকে দেশের সকল লোক এ কথা বুঝেছে যে, রাষ্ট্রনিয়ম ব্যক্তি বিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের খেয়ালের জিনিস নয়, সেই নিয়মের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সম্মতি সম্বন্ধ আছে? যখন থেকে বিজ্ঞানের আলোচনায় তাদের মনকে ভয়মুক্ত করেছে, যখন থেকে তারা জেনেছে সেই নিয়মই সত্য, যে নিয়ম ব্যক্তি বিশেষের কল্পনার দ্বারা বিকৃত হয় না, খেয়ালের দ্বারা বিচলিত হয় না।...সে বিধান শাশ্বতকালের। আজ একরকম, কাল একরকম নয়। বাহিরের জগতেও যেমন, নিজের জ্ঞান ও আনন্দের মধ্যেও সেই বিশ্ব সত্তাকে উপলব্ধি করা, এই হচ্ছে মানব-ধর্মের উদ্দেশ্য।"

"ব্রহ্ম যে সত্য-স্বরূপ তাহা যেমন বিশ্বসত্যের মধ্যে জানি, তিনি যে জ্ঞান-স্বরূপ তাহা আত্মজ্ঞানের মধ্যে বুঝিতে পারি। তেমনি তিনি যে রস স্বরূপ, তাহা কেবল ভক্তের আনন্দের মধ্যেই দেখিতে পাই। ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসে সে দেখা আমরা দেখিয়াছি এবং সে কথা আমাদিগকে দেখাইয়া চলিতে হইবে।"

আজ স্মরণ করি, ধর্মের নবযুগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বাণী :—

নিজেকে যেমন সমস্ত আবরণ হইতে মুক্তি দিয়া সত্য করিয়া দেখিতে হইবে নিজের ধর্মকেও তেমনি করিয়া তাহার সত্য আধারের মধ্যে দেখিবার সাধনা করা চাই। আমাদের ধর্মকেও যখন সংস্কারে আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করিতে থাকি তখন কেবল তাহাকে নিজের নানা প্রকার ক্ষুদ্রতার

দ্বারা বিজড়িত করিয়া ফেলি। মুখে যাহাই বলি না কেন, ভিতরে ভিতরে তাহাকে আমাদের সমাজের ধর্ম আমাদের সম্প্রদায়ের ধর্ম, করিয়া ফেলি।

* * *

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্তে এই বাংলা দেশে আজ প্রায় শত বৎসর পূর্বে রামমোহন রায় পৃথিবীর সেই বাধামুক্ত ধর্মের পালটাকেই ঈশরের প্রসাদবায়ুর সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছেন। ইহাও আশ্চর্যের বিষয় যে, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের ঐক্য, তখন পৃথিবীর অন্য কোথাও মানুষের মনে পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পায় নাই। সেদিন রামমোহন রায় যেন সমস্ত পৃথিবীর বেদনাকে হৃদয়ে লইয়া পৃথিবীর ধর্মকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর পরে আজ একশত বৎসর অতীত হলো। সেদিনকার অনেক কিছুই আজ পুরাতন হয়ে গেছে কিন্তু রামমোহন রায় পুরাতত্ত্বের অস্পষ্টতায় আবৃত হয়ে যান নি। তিনি চিরকালের মতোই আধুনিক। কেননা, তিনি যে কালকে অধিকার করে আছেন তার এক সীমা পুরাতন ভারতে; কিন্তু সেই অতীতকালেই তা আবদ্ধ হয়ে নেই। তার অন্য দিক চলে গিয়েছে ভারতের সুদূর ভাবীকালের অভিমুখে। তিনি ভারতের সেই চিত্তের মধ্যে নিজের চিত্তকে মুক্তি দিতে পেরেছেন যা জ্ঞানের পথে সর্বমানবের মধ্যে উন্মুক্ত। তিনি বিরাজ করছেন ভারতের সেই আগামীকালে, যে কালে ভারতের মহা ইতিহাস আপন সত্যে সার্থক হয়েছে, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান মিলিত হয়েছে অখণ্ড মহাজাতীয়তায়। বায়ুপোতে অত্যূর্দ্ধ আকাশে যখন ওঠা যায় তখন দৃষ্টিচক্র যতদূর প্রসারিত হয়, তার একদিকে থাকে যে দেশকে বহু দূরে অতিক্রম করে এসেছি, আর একদিক থাকে সম্মুখে, যা এখনো আছে বহুযোজন দূরে। রামমোহন রায় যে কালে বিরাজ করেন সে কালে তেমনি অতীতে অনাগতে পরিব্যাপ্ত, আমরা তাঁর সেই কালকে আজও উত্তীর্ণ হতে পারি নি।

হে বিশ্বমানবের দেবতা, হে বিশ্বসমাজের দেবতা, এ কথা যেন আমরা একদিনের জন্যও না ভুলি যে, আমার পূজা সমস্ত মানুষের পূজারই মত, আমার হৃদয়ের নৈবেদ্য সমস্ত মানবজয়ের নৈবেদ্যেরই একটি অর্ঘ্য।....

হে ধর্মরাজ, নিজের যতটুকু সাধ্য তাহার দ্বারা সর্বমানবের ধর্মকে উজ্জ্বল করিতে হইবে, বন্ধনকে মোচন করিতে হইবে।....

হে যুগান্তবিধাতা, আজ তোমার প্রলয়লীলার ক্ষণে ক্ষণে দিগন্তপট বিদীর্ণ করিয়া কতই অভাবনীয় প্রকাশ হইতে থাকিবে, বীর্যবান মানবের সহিত আমরা তাহার প্রতীক্ষা করিব তাহাকে জয়শঙ্খধ্বনির সঙ্গে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য আমাদের সমস্ত দ্বার বাতায়ন অসঙ্কোচে উদ্ঘাটিত করিয়া দিব।...আমাদের যাহা কিছু আছে সমস্তই পণ করিয়া, ভূমার পথে নিখিল মানবের বিজয়রথযাত্রায় যেন সম্পূর্ণ নির্ভয়ে যোগদান করিতে পারি।

জয় জয় জয় হে, জয় বিশ্বেশ্বর,
মানবভাগ্যবিধাতা।"